Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 282 – 289
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

দুলাল ঘোষের 'অগ্নিসূত্র' : সময় ও সঙ্কটের জলছবি

রাজীব চন্দ্র পাল
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়, আগরতলা
Email ID : rajivpaul1987@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Partition, Tripura Novel, crisis, Northeast India, Socio-Economical background of Tripura, Culture.

Abstract
Tripura Novelist Dulal Ghosh is one of the names of Novel Literature. By Writing the novel 'Agnisutra', he made the past partition period reality. Even though independence achieved, the crisis of human existence became dire. Unemployment, Political intrigue, Social decay, moral decadence, black market all Poisoned the society. As a result in this novel, the author has created. a Story by Emphasizing the city of Agartala in the context of Bangladesh and northeast India. after the Partition of the country.

Discussion
এক. প্রাককথন : সাহিত্য হচ্ছে ইতিহাস। সাহিত্য তো শুধু সাহিত্য মাত্র নয়। সাহিত্যের প্রতিটি শাখার আধারে ইতিহাস পুঞ্জিভূত থাকে। সেজন্য সহৃদয়বান পাঠক সাহিত্যের পাতা থেকে ব্যক্তি,সমাজ,রাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস অনুধাবন করতে পারেন। চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের যে ক্রমপ্রসার ও ক্রম সমৃদ্ধি ঘটে চলেছে তাতে বাংলাদেশের তথা বাংলা ভাষা কেন্দ্রিক বৃহত্তর ভূখণ্ডের ইতিহাস উপস্থাপিত হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত রাজ্য ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও একথা সমান সত্য। ত্রিপুরার সাহিত্য মানেই ত্রিপুরার ইতিহাস। এখানকার সাহিত্যে ত্রিপুরার রাজন্য আমলের ইতিহাস, বিবর্তন, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনীতি, দাঙ্গা, সমাজ, সংস্কৃতি সমস্তই ঐতিহাসিক স্তর পরম্পরায় চর্চিত হয়ে চলেছে। দুলাল ঘোষের 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাস নিয়েও আলোচ্য কথাগুলো সমান প্রাসঙ্গিক।

ত্রিপুরার ইতিহাস যেমন মজবুত, তেমনি এখানকার সাহিত্যচর্চার ধারা সমৃদ্ধ। আদিবাসী-বাঙালি, হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর মিশেলে এখানকার মিশ্র গণ সংস্কৃতির সাহিত্য বৃহত্তর পরিসরে স্বীকৃতি পেয়েছে। এহেন ত্রিপুরার কথাসাহিত্যিক হলেন দুলাল ঘোষ। তিনি মূলত ছোট গল্পকার। তবে 'অগ্নিসূত্র' ও 'ছদ্মবাস'(২০০১) দুটি উপন্যাস লিখে

তিনি ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসে নতুন পালক সংযোজন করেছেন। বর্তমান আলোচনায় 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাসের বিন্যাসক্রমে সময়, সমাজ ও রাজনীতির দৃশ্য নিয়ে আলোকপাতের প্রয়াস করা হয়েছে।

ত্রিপুরার ঔপন্যাসিক দুলাল ঘোষ। 'অগ্নিসূত্র' তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ১৯৯৯ সালে দেবব্রত দেব সম্পাদিত 'মুখাবয়ব' পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত হয়।[১] পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মোট ১৮৪ টি। ২০০০ সালে অক্ষর পাবলিকেশনস্ থেকে উপন্যাসটি গ্রন্থাবয়ব লাভ করে।[২] ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে ২৬৩ হয়। 'মুখাবয়ব' পত্রিকা থেকে প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণ[৩] পর্যন্ত উপন্যাসটির বিস্তৃত পরিবর্তন করে ঔপন্যাসিক নির্মাণ কৌশলে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৯২-১৯৯৬ সাল। উপন্যাসের কাহিনির সময়কাল ১৯৭০-১৯৮০ সাল। বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণের পাঁচ পৃষ্ঠার একটি সূচনা অংশসহ মোট ২৩টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, 'মুখাবয়ব' পত্রিকায় প্রকাশ থেকে অক্ষর পাবলিকেশনের পরবর্তী রূপান্তরগুলো নিয়েও একটা স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

দুই. পূর্বসূত্র :

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, দুলাল ঘোষের 'অগ্নিসূত্র' নিয়ে এটিই প্রথম আলোচনা নয়। ১৯৯৯ সালে 'মুখাবয়বে' প্রকাশের পর থেকেই এই উপন্যাস বহুল চর্চিত। উপন্যাসটি নিয়ে পূর্ববর্তী আলোচনাগুলোর উল্লেখ করতেই হয়।
ক. শিশির কুমার সিংহ 'ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস' গ্রন্থে সপ্তম অধ্যায়ের ৩৪৯ পাতায় তিনটি পরিচ্ছেদে 'অগ্নিসূত্র' নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪]
খ. নির্মল দাশ "পটভূমি ত্রিপুরা : দর্পণে দ্বাদশ উপন্যাস" গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় 'অগ্নিসূত্র বয়ানে বিম্বিতকাল ও রাজনীতি' প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।[৫]
গ. অমলেন্দু চক্রবর্তী লিখেছেন 'চেনা ভারতবর্ষ, অচেনা ভূগোল'।[৬]
ঘ. মাম্পী গুপ্ত লিখেছেন 'দুলাল ঘোষের অগ্নিসূত্র শাসক ও শোষণের অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তি'।[৭]
ঙ. শুভাশিস তলাপাত্র লিখেছেন 'প্রান্তিকায়িত অস্তিত্বের আখ্যান'[৮] প্রভৃতি।
বিদগ্ধ গুণীজনদের উল্লিখিত আলোচনাগুলোর বৈদগ্ধময়তার কথা স্বীকার করে নিতে হয়। তবুও 'অগ্নিসূত্র' নিয়ে পুর্ণমূল্যায়নের অবকাশ থেকেই যায়। পূর্ববর্তী আলোচকগণ কেউই উপন্যাসটির সপ্তম পর্বের অপ্রাপ্তির কথা উল্লেখমাত্র করেননি। তাহলে 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাসের সংস্করণগত তারতম্যের দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। তবে বর্তমান আলোচনায় পাঠ প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে 'অগ্নিসূত্র' নিয়ে খানিকটা অভিমত তুলে ধরা হল।

তিন. বিষয় বিন্যাস :

সময়, সমাজ ও রাজনীতি 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাসের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে। আর সমাজ কিভাবে মানব মনস্তত্ত্বকে বিবর্তিত করেছে তা লেখক দেখিয়েছেন। রাষ্ট্র বা দেশ যখন স্বয়ং শোষক, তখন মানুষ যাবে কোথায়? এরকমই সময় ও সমাজের অগ্নিবলয়ে ঘূর্ণায়মান এক প্রজন্মের বাস্তব আখ্যান হচ্ছে 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাস।

উপন্যাসটির কাহিনি পরিসর ও পটভূমিকায় রয়েছে ত্রিপুরার আগরতলা শহর। তবে অবিভক্ত বাংলাদেশের কুশিয়ারা অঞ্চল থেকে শুরু করে আসামের বরাক উপত্যকা,খাছাড়, করিমগঞ্জ, শিলচর, তেজপুর, দরং পর্যন্ত উত্তরপূর্ব ভারতের বৃহত্তম পরিসরে কাহিনির বিস্তার ঘটেছে। দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত, স্ত্রী অতসী সেনগুপ্ত, ছেলে শাণিত, মেয়ে জুঁই, প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র। রাজনৈতিক নেতা পঙ্কজ তলাপাত্র, শাণিতের প্রেমিকা লালিমা দেববর্মা, পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর-নিরঞ্জন বৈদ্য, শাণিতের বন্ধু সারথি দেববর্মা পার্শ্বচরিত্র হিসাবে ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ সমাজ বাস্তবতায় যথাযথ হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বহু অপ্রধান চরিত্র। লেখক প্রয়োজন মত কাহিনিতে তাদের এনেছেন এবং উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

'অগ্নিসূত্র' উপন্যাসের বিস্বিত বয়ানে এসেছে কতগুলো বিশেষ বিষয়। এগুলো যে ঔপন্যাসিকের জীবন অভিজ্ঞতা প্রসূত তা পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করবেন। বিষয়গুলো হল -

ক. দেশভাগ
খ. উদ্বাস্তু সমস্যা-শরণার্থী শিবিরে-ছিন্নমূল পর্ব
গ. ভাষা সংস্কৃতি গত বিভাজনের চিত্র
ঘ. আসাম ও কাছাড় বিরোধ
ঙ. হিন্দু-মুসলমান বিরোধ
চ. ত্রিপুরায় আদিবাসী ও বাঙালি বিদ্বেষ এবং ১৯৮০ সালের দাঙ্গা
ছ. বামপন্থী রাজনীতির উত্থান ও প্রভাব
জ. বেকারত্ব
ঝ. সমকাম যৌনতার প্রসঙ্গ
ঞ. ত্রিপুরার রাজন্যতান্ত্রিক ইতিহাস

চার. দেশভাগ :

'অগ্নিসূত্র' দুলাল ঘোষের বয়ন করা ভারত ও বাংলাদেশের সত্তর ও আশির দশকের ইতিবৃত্ত। এখনও দেশভাগ পরবর্তী দুই ভূখণ্ডের মানুষের বিবর্ণ অস্তিত্বের সংকটের কাল চলছে। দেশভাগের দগদগে ঘা মানুষের মর্মমূলে ক্ষত বাড়িয়ে চলছে। হ্যাঁ এখনো চলছে। দেশভাগের স্মৃতি এখনো আমাদের পিছু ছাড়ছে না। ছাড়বেই বা কেন? এ যে আমাদের মর্মমূলে আঘাত করেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের চক্রান্তে দেশভাগ তো হল, কিন্তু মানুষের আত্মার বলি বন্ধ করা গেল না। 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাস এর প্রমাণ।

১৯৪৭ এ দেশভাগ হলেও মানুষের ঔপনিবেশিক শাসনের কালো ছায়া গেলো না। উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিল। আলোচ্য উপন্যাসে আসামের লাতু মইশাসন বর্ডার দিয়ে দিব্যেন্দু সপরিবারে এপারে ভারতে উঠে এল। উঠে এসেই কি তারা স্থিতু হতে পারল? না,পারল না। দেশভাগের ফলে তারা উদ্বাস্তু হয়ে ছিন্নমূল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ত্রিপুরার আগরতলা শহরে পৌঁছাল। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। উপন্যাস পাঠক তা জানেন। সে সময়কার ভারতের পরিস্থিতি ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু সেনগুপ্তের ভাষায় তুলে ধরেছেন -

> "তখন লাতু মইশাসন দিয়ে ইণ্ডিয়ায় ঢুকে আমরা কি দেখলাম? রিফিউজি ক্যাম্পে ক'দিন থেকেই বুঝে গেলাম ভারতবর্ষখান কেমন হবে। একবার উদ্বাস্তু হয়ে এসেছি, আবার জানি কি হবে। তাছাড়া এখানেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেবার রাজনীতি আছে।"[৯]

উপন্যাসের কথন বিশ্বজুড়ে দেশভাগের বারুদ গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। ফলে একটি পরিবারের কাহিনিকে লেখক বড় করুণ করে দেখিয়েছেন। হবিগঞ্জ থেকে বর্ডার পেরিয়ে আসার চিত্র আরো ভয়াবহ, মর্মান্তিক। প্রাণ ও মান বাঁচাতে পাকিস্তানের সেনাকে শরীরের গয়না খুলে দিতে হয়েছে। এপাড় বাংলায়ও কি শান্তি ও স্বস্তি পাওয়া গিয়েছিল? আসাম, শিলচর হয়ে আগরতলার জীবনেও উদ্বাস্তুরা স্থায়ী হতে পারেনি। জুঁইয়ের বয়ানে দুলাল ঘোষ লিখেছেন -

> "তারপর দাঙ্গায় দাঙ্গায় আমরা উদ্বাস্তু বাঙালিরা যেন কচুরিপানার মত শিকড় আছে অথচ মাটি ছুঁতে পারিনা। তারপর কিছু উল্টোপাল্টা ধারণাও আছে কচুরিপানারা নাকি অন্ধকার পুকুরে হাঁটা হাঁটি করে যেভাবে অভুক্ত অতৃপ্ত কিছু আত্মা আগরতলার ডাস্টবিনগুলি খুঁটে খুঁটে খায়।"[১০]

দেশভাগের অনেক ফল ফলেছে। যেমন উদ্বাস্তু শ্রেণি সৃষ্টি করেছে, শরনার্থী দল বানিয়েছে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, ত্রিপুরার আদিবাসী-বাঙালি বিরোধ ঘনিয়ে এনেছে, ১৯৮০ সালের দাঙ্গা ঘটিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা

হল দেশভাগ মানুষকে নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা শ্রেণিতে পরিণত করেছে। রাজনৈতিক চক্রান্ত ও শোষণ তো আছেই। দিব্যেন্দুর গোটা পরিবার এভাবেই দেশভাগের শিকার হয়েছে। আগরতলা শহরেই তাদের পরিবার মাটিতে মিশে গেছে।

উপন্যাসে ফেলে আসা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তথা বাংলাদেশের জন্য স্মৃতি বিজড়িত কাহিনি আছে। দিব্যেন্দু ও অতসীর স্মৃতিতে বারবার ভিড় করে এসেছে ফেলে আসা স্বদেশের ছবি। হবিগঞ্জ জেলা, মাঠ, পুকুর, নদীর ঘাট, ফেরি, কুশিয়ারা নদী, গাংচিল পাখি সমস্তই এখন স্মৃতি। চাইলেও আর সেই ভূখণ্ডে ফেরা সম্ভব নয়। ভারতের পরবাসই এখন তাদের স্বদেশ। ভারতেই জন্মেছে জুঁই আর শাণিত। কিন্তু তারাও কি জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত মৌলিক অধিকার পেয়েছে? তাই দেশভাগ আমাদের পিছু ছাড়ে নি।

পাঁচ. ইতিহাস :

সাহিত্য তো শুধু সাহিত্য মাত্র নয়, সাহিত্য ইতিহাস। আমি বিভিন্ন লেখায় বিষয়টি বলে এসেছি। বাংলা সাহিত্য শুধু গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা নয়। কাহিনির সমান্তরালে প্রবাহিত হয় সময় ও সমাজের ইতিহাস। সেজন্য সাহিত্যকে ইতিহাস বলতে হয়। সহৃদয় হৃদয়সংবেদী পাঠক 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাসে ইতিহাসের সন্ধান পেতে পারেন। এখানে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ কেন্দ্রিক সমাজ ইতিহাস এবং ত্রিপুরার রাজন্য আমলের ইতিহাস পুঞ্জীভূত রয়েছে।

ত্রিপুরার রাজ ইতিহাস নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবয়ব রয়েছে। 'রাজমালা'[১১] 'শ্রেণীমালা'[১২] 'কৃষ্ণমালা'[১৩] 'গাজীনামা'[১৪] প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখে নিতে পারেন। এই উপন্যাসে শাণিতের বন্ধু সারথি দেববর্মা ও তার বোন লালিমা দেববর্মার প্রসঙ্গ ধরে ত্রিপুরার রাজন্য ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে। সারথি ও লালিমা নক্ষত্র মাণিক্যের বংশধর। এই সূত্রটুকু ধরে দক্ষ লেখক দুলাল ঘোষ রাজ ইতিহাসের স্তরান্তর দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের ছয় সংখ্যক পর্বে কৈলাশচন্দ্র সিংহের 'রাজমালার' প্রসঙ্গ এনেছেন। সারথী তার বংশগত কৌলিন্যে গর্ববোধ করে। আবার বর্তমানে রাজবংশের অবমাননার জন্য ব্যথিত। সারথি বন্ধু শাণিতকে রাজবাড়ির ভগ্নাংশ ঘুরে দেখায়। মালঞ্চ নিবাসের নীচের পাতালপুরীর দৃশ্য, মালঞ্চ নিবাসে বসে রবীন্দ্রনাথের 'যামিনী না যেতে জাগালে না' গান রচনা সমস্তই আমরা যেন নতুন করে জানতে পারি। সারথি নক্ষত্র রায়ের পুরনো রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে সব ছবি দেখিয়ে বলেছে -

> "এই যে দুজনকে দেখতে পাচ্ছিস এরা ফরাসি পর্যটক। ত্রিপুরা এসেছিলেন ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়। তাদের মতে ত্রিপুরায় সোনা আছে, তবে উন্নতমানের নয়। তারপরের ছবি কুমার উৎসব রায়ের। তারপর জগৎরাম মাণিক্য ঠাকুর আর ইনি রাজা মুকুন্দরাম রায়। কিন্তু এইবার যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছিস সবচেয়ে বড় ছবি, রঙ উঠে ধুলার আস্তরণে এখন আর কিছুই বোঝা যায় না। ইনি ত্রিপুরার মহারাজা ছত্রমাণিক্য বাহাদুর। তোমাদের নক্ষত্র রায়। আমার পূর্বপুরুষ।"[১৫]

ইতিহাস উপন্যাসে এভাবেই প্রবেশ করেছে। কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' কে[১৬] ঔপন্যাসিক শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৫০ এর ত্রিপুরার রাজ ইতিহাসের প্রসঙ্গ রয়েছে। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের কথা লেখক বলেছেন। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের নামানুসারেই ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের অঞ্চল ঈশানচন্দ্র নগর নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে সীমান্ত এলাকায় ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের শাসন ছিল।

ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে আদিবাসী প্রজাদের সুসম্পর্ক ছিল না। প্রজারা রাজানুকুল্য পায়নি। উপন্যাসে এই ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। তাই শাণিত রাজ উত্তরসূরী সারথি দেববর্মা ও লালিমা দেববর্মার মধ্যে রাজবংশের শেষ অস্তিত্বের সন্ধান করে। আবার শাণিত পারিবারিক সূত্রে তখিরায় ও খুমতি দম্পতির প্রসঙ্গেও আদিবাসী প্রজাদের অসহায় দৃশ্য কল্পনা করে নেয়। শাণিতের স্পষ্ট বক্তব্য, রাজাদের স্বৈরাচারী শাসনের জন্যেই তো আদিবাসী পাহাড়িদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন। আর এরই কারণ হিসেবে নেমে এসেছে দাঙ্গা। যা ত্রিপুরায় ৮০ সনের দাঙ্গা নামে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে।

লালিমার মনে হয়েছে রাজবংশকে নিশ্চিহ্ন করার কৌশল করেছে সরকার ও সমাজ। লালিমার মুখে এই কথা শুনে শাণিতও খানিকটা ভেবেছে। আর ত্রিপুরার ইতিহাস সচেতন ঔপন্যাসিক দুলাল ঘোষ লিখেছেন -

"ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্রেরও একই অভিমত।"[১৭]

আসলে উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ত্রিপুরার ৭০ ও ৮০ দশকের সমাজ বিবর্তনের অগ্নিগর্ভ রূপরেখা তুলে ধরতে গিয়ে এভাবেই ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

ছয়. মানুষের অস্তিত্বের সংকট :

সময় ও সমাজের সংকটের প্রতিচিত্র হচ্ছে 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাস। সময় যত বিবর্ণ হয়, সমাজ ততই তলিয়ে যায়। আর সমাজের অধঃপতন ও অবনমণ মানুষকে অস্তিত্বের সংকটাপন্ন করে তোলে। সেজন্য সমস্ত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও সংঘাতে, সমস্ত বিশ্বযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষ। উপন্যাসের পরিচ্ছেদ গুলিতে চরিত্রের আদলে লেখক সেই আশির দশকের সমসময়ের মানুষদের কথাই বলেছেন। উপন্যাসের ২৩টি পরিচ্ছেদে লেখক চরিত্রের অন্তর্বয়ান ও স্বগত ভাষণে মনস্তত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। উপন্যাস রচনার এই পদ্ধতি নেহাৎ নতুন নয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'[১৮] (১৯৪২) উপন্যাসেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। দুলাল ঘোষ প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে প্রধান চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক টানা পোড়েনকে তুলে ধরে সময় ও সমাজের সংকটকে বুঝিয়েছেন।

উপন্যাসের পরিচ্ছেদ বিন্যাসে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন কিভাবে এসেছে তা আমরা দেখে নিতে পারি :

এক সংখ্যক পরিচ্ছেদ – দিব্যেন্দুর আত্মকথন
দুই সংখ্যক পরিচ্ছেদ – অতসীর আত্মকথন
তিন সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত সেনগুপ্ত
চার সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত সেনগুপ্ত
পাঁচ সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত সেনগুপ্ত
ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদ – জুঁই সেনগুপ্ত
সাত সংখ্যক পরিচ্ছেদ – বর্তমান সংস্করণে এই পরিচ্ছেদটি নেই[১৯]
আট সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত ও সারথি দেববর্মা
নয় সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত ও সারথি দেববর্মা
দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত ও পঙ্কজ তলাপাত্র
এগার সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত
বার সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত ও জগদীশ দা
তের সংখ্যক পরিচ্ছেদ – অতসী
চৌদ্দ সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত
পনের সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত
ষোল সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত
সতের সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত
আঠার সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত
উনিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত
কুড়ি সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত
একুশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ – শাণিত
বাইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ – দিব্যেন্দু
তেইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ – জুঁই

সুতরাং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের পথেই ঔপন্যাসিক সময় ও সমাজের চিত্রাঙ্কন করেছেন। তাই চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজকে তুলে ধরতে পারি।

দুলাল ঘোষ রক্তের ভেতরে খেলা করা বোধ থেকে চরিত্রগুলোকে তুলে এনেছেন। মানুষের অস্তিত্বের সংকট, অন্তরের অপচয়, রুচির অধঃপতন, রাষ্ট্রিক বিপর্যয় সমস্তই দিব্যেন্দু, অতসী, জুঁই, শাণিত, পংকজ তলাপাত্র প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্র সময়ের শিকার হয়েছে।

দিব্যেন্দু এক অসহায় বাবা। পিতৃসত্তার যন্ত্রণায় সে কাতর হয়। দেশভাগের স্মৃতি বহন করেই বেড়ায়। চোখের সামনে শাণিতকে ও জুঁইকে অস্তিত্বের সংকটের জন্য নষ্ট হতে দেখে। দিব্যেন্দু এখন প্রায় বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে। কানে কম শুনতে পায়। জীবন যুদ্ধে সে নিজেকে ব্যর্থ বলেই জানে। কেবল ফেলে আসা স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। লাঞ্ছিত জীবন চোখের পাতায় ভিড় করে আসে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন -

> "রাতের বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিব্যেন্দুর মনে হল– তিনি যে ইদানিং শুনতে পান না তার একটা প্রধান কারণ অঘুমা আর স্মৃতি। বুড়ো হলে ঘুম হয়না জানা কথা। কিন্তু স্মৃতিরা ইদানিং বিদেশি পাখির মত সাদা কালো আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, মনে হয় – আমারা মাথাতেই সবকথা একসঙ্গে বসতে চাইছে।"[২০]

অতসী উপন্যাসের সময়ের কালের এক অসহায় মা। যার স্বামী এখন রোজগারহীন, স্থিতু হয়ে গেছে। অতসী এমনই একজন মা, যার চোখের সামনে ছেলে ও মেয়ের জীবনের বিপন্নতার ছবি ভেসে যাচ্ছে। ফেলে আসা বাংলাদেশের জীবন, করিমগঞ্জ, শিলচর এবং আগরতলার জীবন সবই অতসী দেখেছে। অভাব, শোষণ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অনির্দিষ্ট যাপিত জীবন অতসী সবই কাটিয়ে যাচ্ছে।

অতসী মা হয়েও বুকে পাথর চাপার মত কষ্ট ও অপমান চেপে রেখে মেয়ে জুঁইকে সাজিয়ে গুছিয়ে উপঢৌকন করে পাঠায়। ছেলে বখাটে হয়ে গেছে। তাই মেয়ের রোজগারের উপর সংসার নির্ভর করছে। সে রোজগার যে অবৈধ, সে রোজগার যে কখনো শরীরের বিনিময়ে হচ্ছে তা অতসী জানেন। কিন্তু কিছুই করার নেই। দীর্ঘশ্বাস অতসীর নিত্যসঙ্গী। মাতৃত্বের করুন প্রতিনিধি অতসীর একটি আত্মদংশিত সংলাপ তুলে ধরা যেতে পারে -

> "আমি আর পারছি না"[২১]

শাণিত দেশভাগ পরবর্তী সময়ের বেকারত্বের প্রতিনিধি। আজীবন সে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করেছে। কিন্তু হেরে গেছে। শিলচর থেকে চাকরি তথা কাজ নিয়ে শাণিত আগরতলায় আসে। বন্ধু সারথির বোন লালিমা দেববর্মাকে ভালোবাসে। আবার সে নিজের অস্তিত্ব জাহির করার জন্য সমকামী পঙ্কজ তলাপাত্রের শোষণের শিকার হয়েছে। সে চোরাকারবারের সাথে যুক্ত হয়েছে। নিষ্পেষিত হয়েছে, উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়েছে। ঘৃণায় তার মন ও জীবন বিষিয়ে গেছে। লালিমাকে নিয়ে সে সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল, তাও পূরণ হয়নি। লালিমাকে দাঙ্গার কবলে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে। আর সেই ক্ষোভে শাণিত অপমানের প্রতিশোধ নিতে পঙ্কজ তলাপাত্রকে খুন করেছে এবং ফেরার হয়ে গেছে। শাণিত প্রতিবাদী চরিত্র। আর সেই সময়ের সমাজের প্রেক্ষিতে শাণিতের প্রতিবাদ স্বাভাবিক ছিল।

সময় কত কঠিন ছিল সেসময় তা জুঁই চরিত্রকে দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। জীবন সহজ ছিল না। বাবা রোজগারহীন, মা অসহায়, ভাই ফেরার আসামি। বাধ্য হয়েই জুঁই সংসারের দায়িত্ব নিয়েছে। সে শিক্ষিত। রাষ্ট্রিক বিপর্যয় যখন চরমে ওঠে তখন মানুষ বড় বেশি অসহায় হয়ে পড়ে। ফলত, মানুষ বাধ্য হয়েই বিকিয়ে যেতে থাকে। জুঁই সংসার বাঁচাতে, প্রাণ বাঁচাতে মান বিসর্জন দিয়েছে। বাবা দিব্যেন্দুর দৃষ্টিতে জুঁইয়ের এই সার্বিক পরিবর্তন ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। দিব্যেন্দু নিজের মেয়ে জুঁই সম্পর্কে বলেছে -

> "মেয়েটা দিনকে দিন কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে। মানুষ চোখে লাগেনা। মাঝ ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সব করে। কোনোদিকে নজর নেই।"[২২]

জুঁই অতীতের স্মৃতিচারণ করে। দিদির মৃত আত্মার সাথে সে যেন কথা বলে। এল.আই.সি অফিসের ডেভেলপমেন্ট অফিসার শশাঙ্ক দা, বান্ধবী কাবেরীর দাদা সাব ইন্সপেক্টর নীরঞ্জন বৈদ্য প্রমুখ পুরুষের কাছে নিজেকে

পয়সার জন্য বিকিয়ে দিয়েছে। টিউশন ছেড়ে গভীর রাতে একা একা বাড়ি ফেরে। প্রথম যৌবনে পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিনে যখন জুঁই রতনদার সঙ্গে শরীরী সুখ অনুভব করেছিল, সেটা তার কাছে পাপ মনে হয়েছিল। আর এখন জুঁই পাপ-পুণ্য বোধহীন। বেঁচে থাকাটাই এখন শেষ কথা। সভ্যতার সংকটে উপন্যাসের চরিত্রগুলো এভাবেই বিবর্তিত হয়ে গেছে।

সাত. পাঠ প্রতিক্রিয়া :

'অগ্নিসুত্র' দেশভাগোত্তর পর্বে বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জ্বলন্ত ইতিহাস। দুলাল ঘোষ সেই আগুনের ঐতিহাসিক সূত্রকে এই উপন্যাসে তথ্যনিষ্ঠ করে তুলেছেন। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, বেকারত্ব, আদিবাসী-বাঙালি বিদ্বেষ, রুচির অপচয় সবেতেই আগুন ধরেছিল। সময় ও সমাজের আগুনের লেলিহান শিখা মানুষের মর্মমূলে আঘাত করে ভস্ম করে দিয়েছিল। তাই 'অগ্নিসুত্র' সমাজের অগ্নিবলয়। আর এখানেই তো দুলাল ঘোষের শ্রেষ্ঠত্ব।

বাংলা সাহিত্যে 'অগ্নিসূত্রের' মতো শিহরণকারী ঝাঁঝাঁলো উপন্যাস কমই লেখা হয়েছে। আবার মাথা ধরে যাওয়া ও বহুসময় রেশ থাকার মত উপন্যাসের ভূমিকা বা মুখবন্ধও আমরা কম পেয়েছি। ভাষায়, বিষয় গাঁথুনিতে উপন্যাসের বিন্যাস ফর্মটি সত্যিই লোভনীয়। ভাষার দু'একটি দৃষ্টান্ত না দিলেই নয়। কারণ দুলাল ঘোষের ভাষাবয়ব গঠন একেবারে আঞ্চলিক শব্দ ঘেঁষা হলেও সার্থক। যেমন –

> "বাবাও দুইটা ঢেঁকুর তুলে আবার খাচ্ছে। শানু এক কোণায় কুচিমুচি করে বসা জুঁইয়ের পাশে গিয়ে বসল ক্যেজাক্যেজি করে। সে একটু আপত্তি করল-এটা কি মা? একেবারে গায়ের ওপর কেন। কিন্তু কিছু করার নেই, এত ছোট পাকঘর। তাছাড়া বাবা এখনও সেই বাংলাদেশি পিঁড়িতে বসে খায়।"[২৩]

উপন্যাসে অনেক বিষয় ছিল যাকে লেখক ইচ্ছে করলে আরো ঘনিয়ে আনতে পারতেন। কিন্তু তিনি কিছু আগলাভাবেই সেগুলো ছুঁয়ে গেছেন। যেমন শাণিত ও লালিমার প্রেম মনস্তত্ত্ব পর্ব, শাণিতের চাকরি, জুঁই ও নিরঞ্জন বৈদ্য প্রসঙ্গ,পঙ্কজ তলাপাত্রের রাজনীতি, এমার্জেন্সির সময় ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি। তবে সচেতন লেখক কাহিনির বিন্যাসধারায় অবাঞ্চিত সমস্ত বিষয়ে এড়িয়ে গেছেন। কাহিনিতে শেষের দিকে এগিয়েছে ততই সংঘাতের ইঙ্গিতের তীব্রতা বেড়েছে। আগুনের সূত্রগুলো একসঙ্গে জড়ো হয়ে অগ্নিবলয় রচনা করেছে।

উপন্যাস তো জীবনের কথাই বলে। দুলাল ঘোষ এই উপন্যাসে জীবনের কথাই তো বলেছেন। কিন্তু এই জীবন তো সরল রেখাঙ্কিত নয়। এই জীবন যে অগ্নিবলয়ে ঘুর্ণায়মান। সময়, সমাজ ও মানুষ যে এই অগ্নিবলয়ে ঝলসে যাচ্ছে। কারোর পরিত্রাণ নেই। দিব্যেন্দু থেকে অতসী, জুঁই, শাণিত, পঙ্কজ সবাই শিকার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? রাষ্ট্র, সমাজ-সময় কে দেবে সদুত্তর? এভাবেই 'অগ্নিসুত্র' উপন্যাস সার্থক রস সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

Reference :

১. দ্র. 'মুখাবয়ব', সম্পাদক - দেবব্রত দেব, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৯

২. ঘোষ, দুলাল, 'অগ্নিসূত্র', অক্ষর পাবলিকেশনস্ আগরতলা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০০

৩. ঘোষ, দুলাল, পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৭

৪. সিংহ, শিশির কুমার, 'ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৮

৫. দাশ, নির্মল, 'পটভূমি ত্রিপুরা: দর্পণে দ্বাদশ উপন্যাস', সৈকত, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ২০১৮

৬. দাস, মণিকা ও রাজীব চন্দ্র পাল (সম্পাদক), 'পূর্বমেঘ' পত্রিকা', ত্রয়োদশ-চতুর্দশ যুগ্ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০২৩, পৃ. ১৩৭

৭. দেব, সৌম্যদীপ, (সম্পাদিত) 'দুলাল ঘোষের কথাকৃতি সম্মিলিত স্খলন এবং একটি বৃষ্টিবীথি', ত্রিষ্টুপ পাবলিকেশনস্ ,ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ-২০২২, পৃ. ৩০

৮. 'পূর্বমেঘ' পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

৯. ঘোষ, দুলাল, 'অগ্নিসূত্র' অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৭

১০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৭

১১. সেন, কালীপ্রসন্ন, 'শ্রীরাজমালা', (চারটি লহর), উপজাতি গবেষণাকেন্দ্র, আগরতলা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৩

১২. দেব বর্মণ, বিক্রম কিশোর ও জগদীশ গণ চৌধুরী, (সম্পাদিত), 'শ্রেণিমালা', উপজাতি গবেষণাকেন্দ্র, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

১৩. দেব বর্মণ, বিক্রম কিশোর ও জগদীশ গণ চৌধুরী, (সম্পাদিত), 'কৃষ্ণমালা', উপজাতি গবেষণাকেন্দ্র, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭

১৪. বর্মণ, রমেন্দ্র, (সম্পাদিত), 'গাজীনামা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০১

১৫. ঘোষ, দুলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১৬. সিংহ, কৈলাশচন্দ্র, 'রাজমালা', উপজাতি গবেষণাকেন্দ্র, আগরতলা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯

১৭. ঘোষ, দুলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

১৮. ভাদুড়ী, সতীনাথ, 'জাগরী' সমবায় পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৫৩।

১৯. বর্তমান সংস্করণে কিংবা প্রথম সংস্করণেও উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদটি অনুপস্থিত। কিন্তু কেন? বিষয়টি নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

২০. ঘোষ, দুলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

২১. ঘোষ, দুলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৬

২২. ঘোষ, দুলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৬

২৩. ঘোষ, দুলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭